যুগান্তর

তারিখ: 13 FEB 2014 ... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

মোঃ আবু সালেহ সেকেন্দার

আদর্শচ্যুত পথভ্রষ্ট ছাত্র রাজনীতি

উচ্চশিক্ষা প্রসারে বড় বাধা ছাত্র রাজনীতি। যদিও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব থেকেই ছাত্র রাজনীতির বিকাশ। শিক্ষাঙ্গনকে অস্থিরতামুক্ত রাখাই ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে ছাত্রনেতারা ওই লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে বহুগুণ দূরে সরে যায়। কতিপয় ছাত্রনেতার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্যগত 'কৃতিত্ব' ব্যবহার করাতে পুরো ছাত্র রাজনীতিই একসময় পথ হারায়। কয়েক যুগ আগে ছাত্র রাজনীতির ট্রেন লাইনচ্যুত হলেও কোনো সরকারই ছাত্রনেতাদের লাইনে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং সব সরকারই নিজেদের পেটোয়া বাহিনী হিসেবে ছাত্রনেতাদের ব্যবহার করেছে। মিছিল-মিটিংয়ে লোক সমাগম নিশ্চিত করতে অথবা হরতাল-অবরোধে পিকেটিংয়ের দায়িত্ব ছাত্রনেতাদের দিয়ে নিশ্চিত থেকেছে। ছাত্রনেতারাও ব্যক্তিগত লাভের আশায় সরকার বা বিরোধী দলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। উপরতলার আশীর্বাদ নিয়ে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, অস্ত্রবাজি করে গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি পথ হারানোর কারণে অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গন অস্থির হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন একেকটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে বারুদের মতো জ্বলে উঠছে ক্যাম্পাস, মৃত্যুপুরীতে পরিণত করাই যেন সময়ের ব্যাপার। আদর্শচ্যুত ও পথভ্রষ্ট ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বগুণে (!) প্রত্যেকটি ক্যাম্পাসই কারণে-অকারণে অস্থির হওয়াই স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। অছাত্রদের কাঁধে ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্ব থাকাও এই অস্থিরতার অন্যতম কারণ বটে। গত কয়েক দশকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ছাত্র নেতৃত্ব অছাত্রদের হাতে চলে গেছে। বাবা-দাদা-নানারা এখন তাদের নাতি-পুতিদের নেতা। যদিও এক্ষেত্রে কয়েকটি বাম সংগঠনে নিয়মিত ছাত্ররাই ছাত্রনেতার দায়িত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগও তাদের আগের 'বয়স্ক নেতৃত্বে'র ধারা পরিহার করে গত কয়েক বছর ধরে ছাত্রনেতাদের বয়সের ফ্রেম বেঁধে দিয়েছে। অন্য সংগঠনগুলোর তুলনায় ছাত্রলীগের এ উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য হলেও নিয়মিত ছাত্রদের হাতে ছাত্র নেতৃত্ব তুলে দেয়ার জন্য এ উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। কারণ এখন একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকায় ২৩-২৫ বছরের মধ্যে। সেখানে ছাত্রলীগের নেতা হওয়া যায় ২৯ বছর বয়সেও। ফলে এখনও অনিয়মিত ছাত্ররা এ সংগঠনের নিয়মিত ছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নিয়মিত ছাত্রদের হাতে ছাত্র নেতৃত্ব তুলে দিতে ছাত্রলীগের বয়সের ফ্রেম আরও কমিয়ে আনা উচিত। বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছেন : 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের নাম বদলিয়ে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' করা হয়েছে।... কার্যকরী কমিটির সদস্য প্রায় অধিকাংশ ছাত্র নয়... আমরা এই কমিটি মানতে চাইলাম না' (পৃ.৮৮)। যেখানে বঙ্গবন্ধু অছাত্র নেতৃত্ব মানতে চাননি; সেখানে অছাত্র নেতৃত্বে ছাত্রলীগ পরিচালিত হওয়াটা কতটুকু শোভনীয়? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ঘটনা সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একজন নেতৃত্ব পাওয়ার আগেই ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল। ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য অস্ত্র হাতে গুলি চালানোর কুখ্যাতিও তার রয়েছে। কিন্তু নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেল অস্ত্রবাজ-ডাকাতকেই ওই ইউনিটের ছাত্রলীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। ডাকাতি মামলার আসামি ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তেড়ে যাওয়াই যদি শীর্ষ পদ পাওয়ার যোগ্যতা হয়ে থাকে; তবে অন্য জুনিয়র কর্মীরাও সে পথেই হাঁটবে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? আজ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বর্তমান ঘটনার কোনো দায় নিতে রাজি নয়। নামকাওয়াস্তে দুই-একজনকে বহিষ্কার করে নিজেদের দায় এড়াতে চায়। কিন্তু কোনোভাবেই তারা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ন্যক্কারজনক ঘটনার দায়ভার এড়াতে পারে না। যদি সেদিন ডাকাত-অস্ত্রবাজকে শীর্ষ নেতা হিসেবে মনোনীত না করা হতো; তবে ওই সংগঠনের কর্মীরা নিশ্চয়ই এই বার্তা পেত যে, ছাত্রলীগের নেতা হতে হলে ডাকাত-অস্ত্রবাজ হওয়া চলবে না। আজ যতই বহিষ্কার নাটক করা হোক না কেন, বহিষ্কৃতরা ঠিকই জানে যে, এটা আইওয়াশ। আগামী দিনে নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের এই অস্ত্রবাজির যোগ্যতা ঠিকই কাজে লাগবে। আগের ইতিহাসই তাদের এমন সাহস জোগাবে!

> শুধু মুখে নয়, কাজেও আমরা প্রমাণ দেখতে চাই যে, ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী নয়; ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন।

দুই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ছাত্রলীগ তাদের কোনো সহযোগী সংগঠন নয়। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। অনেক দিন পর আওয়ামী লীগের এমন বোধোদয় হওয়াতে ভালোই লাগছে। শুধু মুখে নয়, কাজেও আমরা প্রমাণ দেখতে চাই যে, ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী নয়; ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। আওয়ামী লীগের অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়, ছাত্রলীগের সঙ্গেও ওই রকম আচরণ করা হচ্ছে, অচিরেই সেই বিষয়টি যেন প্রমাণিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে অথবা আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণার অনুষ্ঠানে আমরা আওয়ামী লীগের অন্য কোনো ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনকে উপস্থিত থাকতে দেখিনি। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাদের ওই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে বহুবার দেখেছি। প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ অধিবেশনে অন্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতারা সফরসঙ্গী না হলেও ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতে ওই সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের মতো ছাত্রলীগের নেতাদেরও একই দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে এমনটি আশা করি। যাতে ছাত্রলীগের নেতারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রলীগ সরকারের কোনো সহযোগী সংগঠন নয়। অন্য সংগঠনের মতো অপরাধ করলে তাদেরও পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ গ্রন্থে হারুন-অর-রশিদ বলেন : 'ছাত্রলীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র চার মাস উনিশ দিন পর এর প্রতিষ্ঠা (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮)' [পৃ. ৪৫]। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ওই রকমই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন এনএসএফের গুণ্ডারা লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতিতে মেতে উঠে ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল; তখন ছাত্রদের কল্যাণার্থেই ছাত্রলীগের সৃষ্টি। এই কারণে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাত্র সমাজকে জানাতে প্রচারিত মেনিফেস্টোতে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি পরিহার করে নিয়মিত ছাত্রদের হাতে ছাত্র রাজনীতি ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টি স্থান পেয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ ছাত্রলীগসহ সমগ্রিক ছাত্র রাজনীতিই লেজুড়বৃত্তি করছে। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক তার আজ্ঞাবহ হয়ে ক্যাম্পাস দখল ও সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নই ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে প্রশাসনের ইচ্ছায় ছাত্রলীগ হামলা চালিয়েছে। চার সহকারী প্রক্টরের গোপন তৎপরতায় বিষয়টি ধরা পড়েছে। ছাত্রলীগের এমন হীন কর্মের লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে খুশি করা। ওই ঘটনায় ছাত্রলীগের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলেও ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সেখানে স্থান পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, ছাত্রনেতাদের লেজুড়বৃত্তি মানসিকতাই এই সংকটের জন্ম দিয়েছে।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রেও ২৪ (ক)-তে বলা হয়েছে যে, 'ছাত্রলীগের স্বার্থে, প্রার্থীদের উপযুক্ততা ও স্ব-স্ব এলাকার সদস্যদের মনোভাবের ভিত্তিতে তারা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী সংসদের কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করবেন' (পৃ. ১৭)। গঠনতন্ত্রের এই ধারা সংশোধন করে যদি ছাত্রলীগের স্বার্থের পরিবর্তে সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থে নেতা নির্বাচন করা যায়; তবে ভবিষ্যতে অনেক সংকট থেকে এই সংগঠন মুক্ত হবে। সামগ্রিক ছাত্র রাজনীতিও পরিশুদ্ধতার পথ খুঁজে পাবে। নেতাকর্মীরা যদি প্রকৃত বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হয়ে থাকে; তবে তাদের উচিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মনেপ্রাণে ধারণ করে ছাত্রলীগের স্বার্থে নয়, ছাত্রদের ও দেশের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বলেছেন : 'আমরা ছাত্র ছিলাম, দেশকে ভালোবাসতাম, দেশের জন্য কাজ করতাম' (পৃ. ৩৫)। ছাত্রলীগকেও কোনো সরকারের স্বার্থে অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ না করে বঙ্গবন্ধুর মতো দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে। আর সত্যিকার অর্থে ছাত্রলীগ যদি দেশের জন্য, ছাত্রদের জন্য রাজনীতি করতে পারে; তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না।

মোঃ আবুসালেহ সেকেন্দার : *শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

salah.sakender@gmail.com